জাতীয় পতাকা

শ্রীসুধেন্দুশেখর দাশগুপ্ত
প্রণীত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুখবন্ধ

শ্রীমান সুধেন্দু তার 'জাতীয় পতাকা' বইখানির মুখবন্ধ লিখতে অনুরোধ করাতে আমাকে একটু বিব্রত হ'তে হ'য়েছে। আমি সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি মাত্র কিন্তু সাহিত্যিক নই। তাই আমার পক্ষে এ কাজের ভার নেওয়া অনেকটা অনধিকার চর্চ্চা। দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই নিজের দেশের 'জাতীয় পতাকা'র ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ পুস্তক যে জ্ঞান দিতে সাহায্য করবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের 'জাতীয় পতাকা'র সাথে সাথে পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশের পতাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াতে পুস্তকখানি অধিকতর মনোরম হয়েছে।

বাংলা ভাষা ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সব বিষয়ের পুস্তকের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠুক, ইহা আমাদের সকলেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা। জাতির অগ্রগতির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। এই ছোট পুস্তকখানি সেই হিসাবে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

জাতীয় পতাকা

আত্মচেতনা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতিই স্বীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক একটি প্রতীকের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। আর ইহারই ফলে উদ্ভাসিত হইয়াছে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের জাতীয় পতাকা। জগতের সকল সভ্য ও স্বাধীন জাতির গোড়ার দিকের ইতিহাস আলোচনা করিলেই এই সত্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। জাতীয়তাবোধ প্রবলভাবে জাগ্রত হইবার পূর্বেও ব্যক্তিবিশেষ আপন আপন রুচি, মর্যাদা ও আদর্শ অনুযায়ী কোন না কোন প্রতীক ধারণ করিতেন। প্রাচীন ইউরোপ ও এশিয়ার বিশিষ্ট বীরগণ যুদ্ধের সময় পোষাকে, বর্শায় বা ঢালে নিজস্ব বিশিষ্ট চিহ্ন ধারণ করিতেন। সেই চিহ্ন দেখিয়া দূর হইতেই অনায়াসে বলা যাইত কে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। আমাদের দেশেও প্রাচীন কালে কোনও বিশেষ ধরণের বাহন, রথ অথবা রথধ্বজ দেখিয়া যোদ্ধাদের পরিচয় জানা কষ্টকর ছিল না। তবে তখন পর্যন্ত ইহা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কালক্রমে গোষ্ঠী, সমাজ ও জাতি গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ব্যক্তিগত শৌর্য, বীর্য বা বৈশিষ্ট্যের প্রতীক

ব্যক্তির সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া গোষ্ঠীর বা জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইল।

ঠিক কবে হইতে যে ধ্বজা বা পতাকার উদ্ভব তাহা বলা দুরূহ। তবে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যুদ্ধের বর্ণনায় এক যোদ্ধা অপর যোদ্ধার রথধ্বজ কাটিয়া ফেলিলেন—এরূপ ঘটনার পরিবেশন রামায়ণ, মহাভাবত এবং অন্যান্য পুরা কাহিনীতে নিতান্ত অল্প নহে। অর্জুন কপিধ্বজ ছিলেন। রথের ধ্বজা কাটা যাওয়া পরাজয়ের অপমানের চেয়ে কম গ্লানিকর ছিল না। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন সৈন্যদলের বিভিন্ন রকমের প্রতীক ছিল। প্রাচীন পারস্য, চীন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেরই নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ছিল।

আজকাল আমরা পতাকা যে আকারে দেখি, এ আকার যে প্রথম হইতেই প্রচলিত ছিল না—ইহা বলা বাহুল্য। প্রাচীন যুগে ব্যক্তিবিশেষ কাঠ, পাথর বা কোন ধাতব পদার্থ খোদাই করিয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় মত প্রতীক ধারণ করিতেন। ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে প্রথম প্রথম এমন সব প্রতীক ব্যবহৃত হইত যাহাতে অপরের মনে শঙ্কা বা সম্ভ্রমের উদয় হয়। জন্তু, জানোয়ার, নৌকা, বিকট প্রতিমূর্তি বা নামাঙ্কিত ফলক—এগুলি ছিল আদিম যুগের প্রতীক। কিন্তু পরবর্তী যুগে পাখী আসিয়া ধীরে ধীরে পশুর

স্থান অধিকার করে। ঈগল, বাজ, কপোত, ড্রাগন প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বহুদেশের জাতীয় পতাকায় স্থান লাভ করিয়াছে। লাঠির মাথায় বা বর্শাফলকে এই সব মূর্তি স্থাপন করা হইত, আর এই জাতীয় প্রতীক বহন করার সৌভাগ্য ব্যক্তিমাত্রেরই ছিল পরম ঈপ্সিত। পূর্বোক্ত প্রতীক চিহ্নগুলি ছাড়াও নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিবিশেষের, পরিবারের, গোষ্ঠীর বা জাতির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পতাকা হিসাবে বস্ত্রের ব্যবহারের কাল নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যুগে যুগে প্রতীক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত মালমসলারও পরিবর্তন হইয়া বস্ত্রদ্বারা পতাকা তৈরীর প্রথা সকল দেশেই গৃহীত হইয়াছে।

পতাকার ইতিহাসে ধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধ্য যুগে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা কোন না কোন ধর্মমতের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত ছিল। ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা আজিও ক্রুশচিহ্ন বহন করে। ফ্রান্সের পতাকাও বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত ক্রুশ চিহ্ন ধারণ করিত। ডেনমার্কের জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। কথিত আছে যে ১২১৯ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ভাল্ডমার যুদ্ধে যাইবার সময় কোন শুভ লক্ষণ দেখিবার আশায় আকাশের দিকে তাকান। সে সময় তিনি নাকি আকাশে প্রকাণ্ড একটা ক্রুশচিহ্ন জ্বল জ্বল করিতে দেখেন। তখন হইতেই ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে ক্রুশচিহ্ন ডেনমার্কের জাতীয়

পতাকায় স্থান পায়। এই কাহিনীটির মধ্যে সত্যতা থাকুক বা না থাকুক, ডেনমার্কের জাতীয় পতাকা 'ডানেব্রগ' (ডেনমার্কের শক্তি) যে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত ইহা সত্য।

আমাদের দেশেও দেখি রাজপুত এবং অন্যান্য রাজগণ বিভিন্ন প্রকারের ছত্র প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ছত্রই ছিল সৈন্যদলের উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস। কোনও কারণে এই ছত্র দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে বিষম অনর্থ হইত। 'ছত্রভঙ্গ' কথাটার উৎপত্তি এই ছত্রভঙ্গ হইতেই। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজীর 'গৈরিক পতাকা' ভারতবর্ষের এক স্মরণীয় বিষয়। এই গৈরিক পতাকার পটভূমিকাও ছিল ধর্মের আদর্শ—ইহা ছিল ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক।

ধর্মমত-নিরপেক্ষ এবং জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারায় মহিমান্বিত হইয়া যে সব পতাকা বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে, তাহার সবগুলিই আধুনিক যুগের। পূর্বে ধর্ম ও রাষ্ট্র ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই রাষ্ট্রীয় পতাকায় ধর্মের এত প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কাঠামোতে ধর্মের স্থান নাই। তাই আধুনিক রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ধর্ম-নিরপেক্ষ।

জাতীয় পতাকা জাতির মর্যাদাবোধেরই পরিচায়ক। তাই জাতীয় পতাকাকে লাঞ্ছিত হইতে দেওয়া জাতির সর্বাপেক্ষা

কলঙ্কের কথা। নিজের সর্বস্ব পণ করিয়া জাতীয় মর্যাদার প্রতীক জাতীয় পতাকাকে রক্ষা করিতে দেশে দেশে কত ব্যক্তি যে কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জাতীয় সম্মান রক্ষার্থে আত্মবিসর্জন দিয়া এই বীর শহীদগণ শুধু যে নিজের দেশের লোকের নিকটই বরণীয় হইয়া আছেন তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীর লোকের হৃদয়েও তাঁহারা শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়া আছেন, থাকিবেনও।

ক্ষুদ্র রঙ্গীন একটি বস্ত্রখণ্ডকে জাতীয় পতাকা নামে অভিহিত করিয়া তাহার জন্য অসহনীয় লাঞ্ছনা সহ্য করা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করা এক ধরণের পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু জাতির জীবনে ইহারও প্রয়োজন আছে। ইহা জাতির উন্নতিরই সহায়ক, অবনতির নহে। একটি 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়িতে দেখিলে প্রত্যেক ইংরেজের মন গর্বে পরিপূর্ণ হয়, রেখা-তারকা সমন্বিত পতাকা দেখিলে আমেরিকানদের প্রাণে এক অপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হয়, স্বস্তিক পতাকা দেখিলে প্রতিটি জার্মানের মন শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে, আর উদীয়মান সূর্য-শোভিত পতাকা প্রত্যেকটি জাপানীর মনে ভবিষ্যৎ গৌরবের বিপুল সম্ভাবনা বহন করিয়া আনে। নামহীন রাজ্যের আবিষ্কর্তাগণ, অজানা দেশের অভিযাত্রিগণ, সুদূর পিয়াসী ভূ-পর্যটকগণ দুরন্ত সাহসে ভর করিয়া নূতন নূতন দেশের, নূতন নূতন দ্বীপের, দুরধিগম্য পর্বতশৃঙ্গের আবিষ্কার

করিয়া তথায় সর্বাগ্রে নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা সগর্বে উত্তোলন করিয়াছেন, এবং স্বীয় দেশের গৌরবের কাহিনী চিরতরে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই, এই জাতীয় পতাকা জাতিকে, ব্যক্তিকে যুগে যুগে যে প্রেরণা, যে শক্তি, যে উন্মাদনা যোগাইয়াছে, তাহা পৌত্তলিকতা বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই পৌত্তলিকতা জাতিকে অগ্রগতির সন্ধান দিয়াছে বলিয়াই জাতি ইহাকে সম্মানের সিংহাসনে বসাইয়া দিনের পর দিন পূজা করিয়া আসিতেছে।

অবস্থানভেদে পতাকার তাৎপর্য

সমুদ্রে যদি কোনও জাহাজের মাস্তুল হইতে জাতীয় পতাকা অবনমিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জাহাজখানি প্রতিপক্ষের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

যদি একদেশের পতাকা অপর দেশের পতাকার ঊর্ধ্বে উড়িতে থাকে তো বোঝা যাইবে যে, পূর্ববর্তী দেশটি অপর দেশটিকে পরাজিত করিয়াছে।

এইজন্যই শান্তির সময় সকল দেশের পতাকা সমান ঊর্ধ্বে উড়িতে দেখা যায়। যদি কোনও দেশের পতাকা অপেক্ষাকৃত উচ্চে থাকে তবে তাহা অপমানসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভ্রমক্রমে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে অবিলম্বে এটি স্বীকার করিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিতে হয়।

অর্ধ অবনমিত পতাকা সকল জাতির পক্ষেই শোক-জ্ঞাপক।

কোন জাহাজ হইতে বিপদসূচক সংকেত জানাইতে হইলে জাতীয় পতাকা উল্টা করিয়া (অর্থাৎ উপর দিক্ নীচে দিয়া) উত্তোলিত হয়। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বুঝাইতে হইলে পতাকার ঠিক মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতে হয়।

প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশের জাতীয় পতাকা

আমেরিকা—স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে আমেরিকার ছোট ছোট উপনিবেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন পতাকা ব্যবহার করিত। এমন কি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও পতাকার ঐক্যসাধন সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান আকার ধারণ করিবার পূর্বে আমেরিকার জাতীয় পতাকাকে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছে।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৩টি রাষ্ট্রের জন্য একটি জাতীয় পতাকা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এক কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জাতীয় পতাকার উপরের দিকের কোণে, পতাকাদণ্ডের পার্শ্বে একটি 'ইউনিয়ন জ্যাক' থাকিবে এবং বাকী অংশে পর্যায়ক্রমে ১৩টি লাল ও সাদা ডোরা থাকিবে। জর্জ ওয়াশিংটন কেম্ব্রিজে সৈন্যবাহিনীর ভার গ্রহণের সময় সর্বপ্রথম এই পতাকা উত্তোলন করেন। কিন্তু

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর স্বাধীন আমেরিকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' ব্যবহার করিতে অস্বীকার করে। ফলে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, আমেরিকার জাতীয় পতাকায় ১৩টি লাল ও সাদা ডোরা থাকিবে এবং উপরের দিকে বামকোণে নীল জমির উপর ১৩টি সাদা তারকা থাকিবে। নবোদ্ভাবিত এই জাতীয় পতাকা ১৭৭৭ সালের জুন মাসে 'রেঞ্জার' নামক রণতরীতে সর্বপ্রথম উত্তোলিত হয়। ১৭৯০ ও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভারমণ্ট ও কেণ্টুকী রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। তখন ১৩টির পরিবর্তে ডোরার সংখ্যা ১৫টি করা হয়। কিন্তু পরে অন্যান্য রাষ্ট্র যোগদান করার ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ডোরার সংখ্যা পূর্বের ন্যায় ১৩টিই থাকিবে, এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য নীল জমিতে একটি করিয়া সাদা তারকা স্থান পাইবে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আরিজোনা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মোট রাষ্ট্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান জাতীয় পতাকায় ৪৮টি তারকা আছে। এই ৪৮টি তারকা ৬টি লাইনে ৮টি হিসাবে অঙ্কিত। ডোরা ১৩টি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী তেরটি রাষ্ট্রের পরিচায়ক।

গ্রেট বৃটেন—গ্রেট বৃটেনের জাতীয় পতাকার নাম 'ইউনিয়ন জ্যাক'। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড এই তিন দেশের জাতীয় পতাকার ঐক্য সাধন করিয়াই

'ইউনিয়ন জ্যাকে'র উদ্ভব। ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকায় রাজা প্রথম রিচার্ডের সময় হইতেই সেণ্ট জর্জের ক্রুশচিহ্ন শোভা পাইত। স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় প্রতীক ছিল সেণ্ট এণ্ড্রুর ক্রুশ, আর আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় প্রতীক সেণ্ট প্যাট্রিকের ক্রুশ। রাজা প্রথম জেম্‌স্‌-এর রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলনের ফলে এই দুই রাজ্যের জাতীয় পতাকা মিলিত রূপ ধারণ করে। সেণ্ট জর্জ ও সেণ্ট এণ্ড্রুর ক্রুশচিহ্নদ্বয় মিলিত হইয়া প্রথম ইউনিয়ন জ্যাকের গোড়াপত্তন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল "গ্রেট ইউনিয়ন"। রণতরীর সম্মুখস্থ পতাকা-দণ্ডের (Jack staff) উপর উড়ানো হইত বলিয়া ইহা 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামে অভিহিত হয়। পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ড গ্রেট বৃটেনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রেট বৃটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট এণ্ড্রু ও সেণ্ট প্যাট্রিকের ক্রুশচিহ্ন সুশোভিত হইয়া বর্তমান ইউনিয়ন জ্যাকের রূপ পরিগ্রহ করে।

ফ্রান্স—ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংঘাতে ফরাসী দেশে জাতীয় পতাকার যত পরিবর্তন হইয়াছে এমন আর কোনও দেশেই হয় নাই। প্রথমতঃ সেণ্ট ডেনিসের পতাকাই ছিল সমগ্র ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা। পরে সেণ্ট মার্টিনের পতাকা সেই স্থান অধিকার করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে বুর্বন রাজবংশের প্রতীক

অস্ত্রশোভিত শ্বেত পতাকা, জাতীয় পতাকারূপে প্রবর্তিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় সুবিখ্যাত ত্রিবর্ণ পতাকার উদ্ভব। এই ত্রিবর্ণ পতাকাই আজও ফ্রান্সের একমাত্র জাতীয় পতাকা। সমগ্র পতাকাটি আড়াআড়িভাবে তিনভাগে বিভক্ত—পতাকা-দণ্ড সংযুক্ত এক-তৃতীয়াংশ নীল, মধ্যের এক-তৃতীয়াংশ সাদা এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ লাল। ত্রিবর্ণ পতাকার উদ্ভাবন এবং বর্ণগুলির অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, নীল অংশ সেন্ট মার্টিনের চিহ্ন, লাল অংশ সেন্ট ডেনিসের এবং সাদা অংশ বুর্বন রাজবংশের প্রতীক বহন করে এবং এই তিনটিকে একত্র করাই ছিল ত্রিবর্ণ পতাকা উদ্ভাবনের আসল অভিপ্রায়। অনেকে একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে রংগুলি প্যারিস নগরীর প্রতীক। নেপোলিয়ন-রাজবংশের সময়ও ত্রিবর্ণ পতাকাই ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পতাকা, তবে তখন সাদা অংশে একটি ঈগল অঙ্কিত থাকিত এবং তিনটি বর্ণের উপরই শোভা পাইত কতকগুলি সোনালী রংয়ের মৌমাছি।

জার্মানী—হিটলারের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানীর জাতীয় পতাকা ছিল সমান্তরালভাবে গাঢ় নীল, লাল ও হলুদ—এই তিনটি রংয়ের সমষ্টি। ১৯৩৩ সালে হিটলারের নাৎসী শাসন কায়েম হইবার পরেই উক্ত পতাকা পরিত্যক্ত হয়। তৎপরিবর্তে যে পতাকা জার্মানীর জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হয় তাহা সর্বত্র স্বস্তিক পতাকা নামে

পরিচিত। স্বস্তিক পতাকাটি লাল; কেন্দ্রস্থলে একটি সাদা গোলকের মধ্যে একটি কালো রংয়ের স্বস্তিক অঙ্কিত। স্বস্তিক প্রাচীন আর্যজাতির প্রতীক। পতাকার বুকে ইহাকে স্থান দিয়া জার্মানদের আর্যত্বের অভিমানই সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হইয়াছে।

রাশিয়া—১৯১৭ সনে জারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া রুশ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক মাস পরে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার শাসন-কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় পতাকার প্রবর্তন করে। রাশিয়ার বর্তমান জাতীয় পতাকা লাল। পতাকা দণ্ডের পার্শ্বে উপরের দিকে অর্ধচন্দ্রাকার একটি সোনালী রংয়ের কাস্তে এবং তাহার উপরে আড়াআড়িভাবে একটি সোনালী রংয়ের হাতুড়ি শোভা পাইতেছে। ইহার কিছু উপরে একটি তারকা অঙ্কিত। লাল রং বিপ্লবের চিহ্ন, কাস্তে ও হাতুড়ি যথাক্রমে কৃষক ও শ্রমিকের প্রতীক। সাম্যবাদী আদর্শ আনুযায়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়া কৃষক-মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠার কামনাই এই পতাকায় অভিব্যক্তি পাইয়াছে।

জগতের সর্বত্র মার্কস্‌পন্থী সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদিগণ

জার্মানীর যে পতাকার বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা বর্তমানে পরিবর্তিত হইয়াছে। কেননা, জার্মানী আজ আর একটি দেশ নয়। পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।

কৃষক ও শ্রমিকদিগকে এই কাস্তে-হাতুড়ি-লাঞ্ছিত রক্ত-পতাকার নীচে সমবেত হওয়ার আবেদন জানান।

তুরস্ক—অর্ধচন্দ্র ও তারকা-চিহ্নিত রক্তবর্ণ পতাকাই তুরস্কের জাতীয় পতাকারূপে গৃহীত। অর্ধচন্দ্র ও তারকা গ্রীকদেবী ডায়েনার প্রতীক। কথিত আছে যে, আলেক-জাণ্ডারের পিতা ফিলিপ একবার কনষ্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। রাত্রির অন্ধকারে ফিলিপের সৈন্যগণ নগর-প্রাচীর ভগ্ন করিতে উদ্যত হইলে ক্ষীণ চাঁদের ও নক্ষত্রের আলোকে তাহারা নগররক্ষীদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ফলে তাহাদের এই উদ্যম ব্যর্থ হয়। এই উপকারের প্রতিদান-স্বরূপ কনষ্টান্টিনোপলের অধিবাসিগণ নগরে দেবী ডায়েনার এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করে এবং অর্ধচন্দ্র ও তারকাকে কনষ্টান্টিনোপল নগরীর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক-সম্রাট দ্বিতীয় মহম্মদ কনষ্টান্টি-নোপল অধিকার করিবার পর উক্ত প্রতীককে তুরস্কের জাতীয় পতাকায় গ্রহণ করেন। সেই হইতেই অর্ধচন্দ্র ও তারকা তুরস্কের জাতীয় পতাকায় শোভা পাইয়া আসিতেছে।

জাপান—পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে উদীয়মান সূর্যের দেশ বলিয়া জাপান খ্যাত। জাপ-সম্রাট সূর্যদেবতার বংশধর বলিয়া কথিত। জাপানের জাতীয় পতাকায়ও উদীয়মান সূর্য শোভা পায়। সাদা পতাকার কেন্দ্রস্থলে একটি লাল

গোলক উদীয়মান সূর্যের এবং চতুর্দিকস্থ লাল রেখাগুলি বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির পরিচায়ক।

চীন -১৯২৮ সনের ৮ই অক্টোবর ডাঃ সান ইয়াত সেন পরিকল্পিত পতাকা চীনের জাতীয় পতাকারূপে গৃহীত হয়। এই পতাকার রং ছিল লাল। উপরে বাম দিকে এক-চতুর্থাংশ নীল এবং নীল অংশে সাদা সূর্যের প্রতিকৃতি। নীল আকাশে সাদা সূর্য কুয়োমিণ্টাং দলের প্রতীক। চীনের জাতীয় পতাকার এক-চতুর্থাংশ জুড়িয়া থাকিয়া ইহা চীনের শাসনতন্ত্রে উক্ত দলের আধিপত্যই ব্যক্ত করিত।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কুয়োমিণ্টাং দলের শাসনের অবসান ঘটে। মাও সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি জেনারেল চিয়াং কাইশেককে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া চীনের শাসনতন্ত্র দখল করে এবং চীন গণতন্ত্র প্রবর্তন করে। ঐ বছরই ২৭শে সেপ্টেম্বর চাইনীজ্ পিপল্স্ পলিটিক্যাল কন্সালটেটিভ কনফারেন্স (Chinese People's Political Consultative Conference) এর প্রকাশ্য অধিবেশনে পুরাতন পতাকার পরিবর্তে নূতন জাতীয় পতাকা প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নব প্রবর্তিত এই পতাকাই চীনের বর্তমান জাতীয় পতাকা। পূর্বের পতাকার মত এই নূতন পতাকার বর্ণও লাল। পতাকাটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থের দেড়গুণ। পতাকার উপরের দিকে বাম অর্ধাংশে একটি সোণালী রংয়ের বড় তারকাকে প্রায় অর্ধ-চন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রহিয়াছে

চারিটি ছোট ছোট সোণালী রংয়ের তারকা। পাঁচটি তারকাই পঞ্চশিরবিশিষ্ট। ছোট চারিটি তারকাই এমন ভাবে অবস্থিত যে তাহদের প্রত্যেকেরই একটি করিয়া শির বড় তারকাটির কেন্দ্রাভিমুখী।

পাকিস্তান—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৭ সনের ৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা লইয়া পাকিস্তান ইউনিয়ন গঠিত হয়। ঐ বছরই ১৫ই আগষ্ট তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পাকিস্তান ইউনিয়নের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন। স্বাধীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নির্ধারণ করিবার জন্য ১১ই আগষ্ট পাকিস্তান গণপরিষদে এক অধিবেশন হয় এবং উক্ত সভায় পাকিস্তান ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলি খান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা প্রদান করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা সমকোণ আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ। দণ্ডপার্শ্বে পতাকার এক-চতুর্থাংশ স্থান সাদা এবং বাকী তিন-চতুর্থাংশ গাঢ় সবুজ। সবুজ অংশের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে শুভ্র অর্ধচন্দ্র এবং তাহার উপরে পঞ্চশিরবিশিষ্ট একটি শ্বেত তারকা চিহ্ন। বলা হইয়া থাকে যে, পাকিস্তানের ন্যূনাধিক তিন-চতুর্থাংশ লোক মুসলমান বলিয়া পতাকার তিন-চতুর্থাংশ সবুজ রাখা হইয়াছে। বাকী এক-চতুর্থাংশ সংখ্যালঘুদের প্রতীক।

চন্দ্রকলা মুসলমান ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাবকাব পাঁচটি শিব পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশ সূচিত কবে।

আমাদের জাতীয় পতাকা

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, ছোটখাট একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রকাণ্ড দেশ স্মবণাতীত কাল হইতেই ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মাঝে মাঝে কোন কোন শক্তিশালী সম্রাট সমগ্র দেশকে তাঁহার অধীনে আনয়নেব চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত এই বিরাট দেশে এক জাতীয়তাবোধ বলিতে আমরা আজ যাহা বুঝি তাহার অভাব তখন থাকিলেও পবস্পরেব মধ্যে একই কৃষ্টি ও সভ্যতার যে সুমহান্ ধাবা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত ছিল ইহা অস্বীকার কবা যায় না। ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষার প্রভাবে ও একই শাসন-ব্যবস্থার লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার নির্জিত প্রবাহ জাতীয়তাবোধের রূপ পরিগ্রহ কবিয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই পরবশ জাতি তাহার প্রথম পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি অন্তরে সঞ্চিত হইতে

থাকিলেও তখন পর্যন্ত ভারতবাসীর অপমানবোধ তেমন তীব্র হইয়া উঠে নাই। তাই তখনকার জাতীয়তাবোধ রূপ পাইয়াছিল বৃটিশ শাসকের নিকট ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে আবেদন-নিবেদনে। ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালীর সুপ্ত বীর্য জাগ্রত হইয়া উঠিল। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সমগ্র বাংলা এক হইল, একই মন্ত্রে গর্জিয়া উঠিল। আবেদন-নিবেদনে ফল হইল না দেখিয়া বয়কট বা বিলাতী বর্জন আন্দোলন প্রবল বেগে চলিতে লাগিল। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। ১৯০৫ সনে প্যারিসে মাডাম কামা ও কয়েকজন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক সমবেত হন এবং একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন। এই তিনটি রংই সমান্তরালভাবে অবস্থিত :— উপরে জাফরান রং, মধ্যে সাদা এবং নীচে সবুজ। জাফরান অংশে ৮টি পদ্ম, সাদা অংশে 'বন্দে মাতরম্' এবং সবুজ অংশের ডান দিকে চন্দ্র ও বাম দিকে সূর্য খচিত। এই পতাকা বার্লিনে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উত্তোলিত হয়। ভারতবর্ষে কিন্তু এই পতাকার প্রচলন হয় নাই।

১৯১৬ সনে যখন মিসেস অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে হোম-রুল আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় আর একটি জাতীয় পতাকার উদ্ভব হয়। এই পতাকায় পাঁচটি লাল ও চারিটি সবুজ লাইন ছিল, বামদিকে উপরের কোণে অঙ্কিত ছিল

'ইউনিয়ন জ্যাক' এবং তাহার ঠিক নীচেই ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারকা। হোমরুল আন্দোলনের সময় ইহা সর্বত্র ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পরে উক্ত আন্দোলনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে ঐ পতাকার অস্তিত্ব লোপ পায়।

উপরে বর্ণিত পতাকাদ্বয়ের একটিও জাতির মনে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে নাই। কারণ যে দুইটি আন্দোলনে এই পতাকার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সাধারণতঃ সহরে এবং সহরের চতুষ্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের বা জনসাধারণের মধ্যে ইহা তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসও উহাদিগকে জাতীয় পতাকা বলিয়া স্বীকার করে নাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে যোগদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের রূপ বদলাইয়া গেল। বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট সহরে, অবশেষে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল এবং অনতিবিলম্বে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজের ন্যায়বিচারে আস্থা হারাইয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস শাসকবর্গের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তাব

গৃহীত হয়। এই সময়ে একটি জাতীয় পতাকার অভাব বিশেষ ভাবে জাতির চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী তখন অহিংস সংগ্রামে জাতির সেনাপতি,— জাতির অভাবের কথা তিনিই সর্বাগ্রে অনুভব করিয়া ১৯২১ সনের ১৩ই এপ্রিল 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' লিখিলেন :—

"সমস্ত জাতিরই একটি পতাকা থাকা দরকার। লক্ষ লক্ষ লোক ইহার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। ইহা যে এক রকমের পৌত্তলিকতা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ধ্বংস করা পাপ, কারণ পতাকা আদর্শেরই প্রতীক। ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করিলে একজন ইংরেজের মনে যে শক্তির সঞ্চার হয় তাহা পরিমাপ করা কঠিন, রেখা-তারকা লাঞ্ছিত পতাকার মূল্য আমেরিকাবাসীদের নিকট অসীম।

ভারতীয়দেরও ঐরূপ একটি পতাকা থাকা দরকার, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিব, যাহার জন্য প্রয়োজন হইলে আমরা জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"

ইহার বহু পূর্ব হইতেই মসলিপত্তনম্ জাতীয় কলেজের শ্রীযুক্ত পি, ভেঙ্কইয়া ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশের বর্ণনা দিয়া ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টা কংগ্রেস বা মহাত্মা গান্ধীর মনে কোন রেখাপাত করে নাই। অবশেষে জলন্ধরের (পাঞ্জাব) লালা হংসরাজ একদিন মহাত্মা গান্ধীর

সঙ্গে আলোচনা করিবার সময় প্রস্তাব করেন যে জাতীয় পতাকায় চরকার স্থান হওয়া উচিত। মহাত্মাজী প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করেন এবং বেজওয়াদায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় শ্রীযুক্ত ভেঙ্কইয়াকে লাল (হিন্দুর রং) ও সবুজ (মুসলমানের রং) পটভূমিকার উপর চরকা আঁকিয়া একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে বলেন। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কইয়া উৎসাহ সহকারে কাজে লাগিয়া যান এবং তিন ঘণ্টার মধ্যেই মহাত্মাজীর নিকট এক পরিকল্পনা দাখিল করেন। কিন্তু সময়াভাবে ঐ পরিকল্পনা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তখন পেশ করা সম্ভব হইল না। পরে মহাত্মাজী তাঁহার মতের পরিবর্তন করেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, শুধু হিন্দু ও মুসলমানের রং থাকিলেই চলিবে না। হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন জাতি রহিয়াছে, তাহার সম্মিলিত প্রতীক হিসাবে সাদা রং পতাকায় থাকা উচিত। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া তাহার প্রতীক লাল রং থাকিবে সকলের নীচে, তাহার পর মুসলমানের রং সবুজ মধ্যে এবং সকলের চেয়ে সংখ্যালঘু অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতীক সাদার স্থান সকলের উপরে। ইহা ছাড়াও সাদা রংকে বলা হইল পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক। জাতির দৃষ্টিতে সবল ও দুর্বল, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থান সমান, তাই পতাকায় সকল রংয়ের জন্য সমপরিমাণ স্থান নির্দিষ্ট হইল।

পতাকার বুকে চরকার স্থান সম্বন্ধে মহাত্মাজী লিখিলেন :—

"…জাতি হিসাবে ভারতের জীবন-মরণ চরকার মধ্যে নিহিত। চরকার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সুখ-সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে—ভারতের প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকই একথার সাক্ষ্য দিবে। এই চরকার আহ্বানে ভারতের নারী-শক্তি ও জনসাধারণ অভূতপূর্ব সাড়া দিয়াছে। জনসাধারণ তো চরকাকে জীবনদাতা বলিয়াই মনে করে। চরকা ভারতের জীবন রক্ষার পক্ষে জল ও বাতাসের মতই প্রয়োজনীয়। আমাদের জাতীয় জীবনে চরকা সর্বাপেক্ষা জরুরী ও স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিয়া আছে। চরকার মারফত আমরা সমগ্র পৃথিবীকে জানাইতে চাই যে অন্ন ও বস্ত্রের জন্য আমরা বহির্জগতের উপর নির্ভর কবিব না। যাঁহারা আমার উপর আস্থা রাখেন তাঁহারা অগোণে আপন গৃহে চরকার আমদানী করিবেন এবং আমার পরিকল্পনা অনুসারে চরকা-লাঞ্ছিত পতাকা গ্রহণ করিবেন।"

বলা বাহুল্য, চরকার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া পতাকাটি হইবে খদ্দরে প্রস্তুত।

জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে জনমত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী যখন 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' প্রবন্ধ লিখেন, তখন পাঞ্জাবের শিখ লীগ শিখদের কালো রং জাতীয় পতাকার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজী শিখদের দাবীর অযৌক্তিকতা দেখাইয়া শিখ লীগের প্রস্তাবের জবাব দিলেন :—

"শিখ বন্ধুগণ অনর্থক পতাকার রং সম্বন্ধে উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপ কালো রংটিকে পতাকার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও এই

আন্দোলনের কোনও সার্থকতা নাই, কেন না এখন পর্যন্ত পতাকার বিষয় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখে আলোচনা বা সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপিত করাও হয় নাই। আপত্তি উঠিয়াছে বলিয়াই যে পর্যন্ত না আমি শিখ বন্ধুগণকে তাঁহাদের দাবীর অযৌক্তিকতা বুঝাইতে পারিতেছি, ততদিন ঐ প্রস্তাব উঠাইব না। সাদা রং অন্যান্য সকল জাতির প্রতীক। নিজেদের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্তের দাবী করার অর্থ এই যে, শিখগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দুইটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহেন না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ না থাকিলে একটি রং রাখিবার কথাই আমি বলিতাম। শিখগণ হিন্দুদের সহিত কখনও কলহ করেন নাই, এবং মুসলমানদের সহিত তাহাদের কলহ হিন্দুদেরই অনুরূপ। আমাদের বিরোধ বা বিভেদের উপর জোর দেওয়া শঙ্কার কারণ। ঐক্যের ক্ষেত্রগুলিকেই আমাদের খুঁজিয়া বাহির করা উচিত।"

শিখদের দাবী মানিলেন না বটে, কিন্তু গান্ধীজী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে তাঁহার পরিকল্পনা উপস্থাপিতও করিলেন না। তৎসত্ত্বেও তাঁহার পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা সর্বত্র কংগ্রেসের সভাসমিতি এবং জাতীয় উৎসব ও শোভাযাত্রাদিতে সগৌরবে শোভিত হইতে লাগিল। বর্ণ তিনটির সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা থাকিলেও মহাত্মাজী নিজে বর্ণ-গুলিকে সত্য, শান্তি ও অহিংসার প্রতীক বলিয়াই গ্রহণ করিলেন এবং সেইমত প্রচার করিতে লাগিলেন।

জাতি যখন জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর হয়, তখনই জাতীয় পতাকা বহন করিবার অধিকার সে লাভ করে। জাতীয় পতাকা জাতির সমষ্টিগত

মর্যাদাবোধেরই প্রতীক। স্বীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাহার সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত—ঊর্ধ্ব আকাশে উড্ডীন থাকিয়া জাতীয় পতাকা সগর্বে এই কথাই ঘোষণা করে। যে জাতি আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই, জাতীয় পতাকা তাহার কাছে মূল্যহীন, উৎসবাদিতে সাজসজ্জার সাধারণ একটি উপকরণ মাত্র। ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা এতদিন আচ্ছন্ন ছিল ; আত্মোৎসর্গ তো দূরের কথা, দেশের ও জাতির সম্মান রক্ষার জন্য সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করিতেও ভারতবাসী পরাঙ্মুখ ছিল। তাই এতদিন পর্যন্ত জাতীয় পতাকার প্রয়োজনবোধও তেমন তীব্র ছিল না। কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আসমুদ্র-হিমাচলে যে বিরাট আলোড়ন সুরু হইল, তাহার ফলে ভারতবর্ষে দেখা দিল একটা অভূতপূর্ব জীবন-স্পন্দন, জাতীয় মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল ভারতের অগণিত নরনারী, আত্মবিসর্জনের জন্য উন্মুখ হইল কোটি কোটি মূক জনসাধারণ। সেই শুভক্ষণেই গান্ধীজী জাতিকে উপহার দিলেন তাঁহার পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা। জনসাধারণ সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিল, সগৌরবে তাহা ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিল, আর যখন শাসক-গোষ্ঠীর নির্মম নিপীড়ন নিয়তির অমোঘ দণ্ডের মত নামিয়া আসিল, হাসিমুখে তাহা বরণও করিল। পরবর্তী কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কত নরনারী পতাকার সম্মান রক্ষায় অত্যাচার

সহ্য করিয়াছে নীরবে, কত তরুণ-তরুণী প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে অকাতরে, তবুও জাতীয় পতাকার মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই।

নাগপুর পতাকা-সত্যাগ্রহ

ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাসে নাগপুর পতাকা-সত্যাগ্রহ এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯২৩ সালের ১লা মে, ১৪৪ ধারা জারি করিয়া নাগপুর সহরের একটি রাস্তায় (সিভিল লাইন) পতাকা লইয়া পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ এই আদেশের প্রতিবাদে জানায় যে পতাকা লইয়া যেখানে খুশী যাইবার অধিকার তাহাদের আছে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মহিলা কর্মীদের মধ্যে এলাহাবাদের শ্রীযুক্তা সুভদ্রা দেবী সর্বপ্রথম সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া পতাকা হস্তে যাইবার সময় গ্রেপ্তার হন। ৩১শে মে (১৯২৩) নাগপুরে এক জনসভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী গবর্ণমেণ্টের কাজের তীব্র নিন্দা করিয়া সকলকে পতাকা-আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। নীচে রাজাজীর বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

"আপনাদেরই নগরীতে এক তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এক প্রস্তাব দ্বারা দেশবাসীর মনোভাব এদিকে

আকর্ষণ করিয়াছেন। কোন কোন বন্ধু মনে করেন যে ইহা তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে এবং কয়েকজন লোক একখানি বস্ত্রখণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা করিল কি গ্রেপ্তার হইল তাহাতে কিছুই যায় আসে না। জাতীয় পতাকার জন্য এই সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য কি না সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? বৃটিশ সরকারের কর্মচারিবৃন্দ সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি এই তুচ্ছ ঘটনার জন্য এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইহা হইতেই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাসেবকগণ কখন একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত খদ্দরের টুকরা লইয়া এখানে আসিবে তাহার প্রতীক্ষায় ইঁহারা কেন সময় নষ্ট করিতেছেন? কেন তাঁহারা স্বেচ্ছা-সেবকগণকে যাইতে না দিবার জন্য ধৈর্যসহকারে এখানে অপেক্ষা করেন? আমি কাল হইতেই এই ঘটনা লক্ষ্য করিতেছি এবং সেই সঙ্গে ইহাও ভাবিতেছি যে এই সব পদস্থ কর্মচারী, যাঁহারা সময়ের মূল্য বোঝেন, কেন আপাততুচ্ছ একটি ঘটনার জন্য সময়ের অপব্যবহার করিতেছেন? আমি যদি তাঁহাদিগকে সিনেমায় বা থিয়েটারে যাইবার আহ্বান জানাই, তাঁহারা যাইবেন কি? তাঁহারা মনে করেন, স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতীক্ষায় থাকিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া জেলে পুরিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের উচ্চ বেতনের মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

"কাজেই একথা পরিষ্কার যে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সংগ্রামের গুরুত্ব না বুঝিলেও সরকারী কর্মচারিগণ সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। মনেও করিবেন না যে তাঁহারা শুধু স্ফূর্তি করিতেই এখানে বসিয়া আছেন। সরকারী হুকুমেই তাঁহারা এরূপ করিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। এই শ্বেতকায় জাতি ও তাহাদের গবর্ণমেণ্ট জানে পতাকার অর্থ কি! তাহারা এ কথাও জানে যে, হস্তপরিমিত ক্ষুদ্র একটি মেঘখণ্ড কি করিয়া নিমেষের মধ্যে বিরাট

প্রভঞ্জনে পরিণত হইতে পারে। এই দুঃসহ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সরকারী আদেশ অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে দলে দলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য হাজার হাজার টাকা বেতনের কর্মচারী নিয়োগ করিতে তাই তাহারা দ্বিধা করে না। তাহারা জানে যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অর্থ এই যে, বৈদেশিক শাসকের আদেশ আমরা কেবলমাত্র ভীতিবশতঃ পালন করিব না, তাহাদের হুকুম পালন করা না-করা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন। যত দিন পর্যন্ত এসব আদেশ আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের মত অমোঘ বলিয়া মানিয়াছি, ততদিন আমরা ক্রীতদাস ছিলাম; কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা সঙ্কল্প করিলাম যে মানা না-মানা আমাদের খুশী, সেই মুহূর্তেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম।

"আসল কথা হইতেছে এই যে, গবর্ণমেণ্ট এই বর্ণ তিনটির একত্র সমাবেশ সুনজরে দেখে না। যদি কোন খৃষ্টান বা পার্শী একটি সাদা নিশান, একজন হিন্দু একটি লাল নিশান ও একজন মুসলমান একটি সবুজ নিশান বহন করিত, তবে গবর্ণমেণ্ট মোটেই বাধা দিতে আসিত না। যদি খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ও মুসলমান রাস্তায় দাঁড়াইয়া লড়াই করিত, সরকারের নিকট তাহা পরম উপভোগের বিষয় হইত। কিন্তু পতাকায় এই বর্ণ তিনটির সমাবেশ হইলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্বনাশের কথা। এই জন্যই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণীত আইনের অপব্যবহারের দ্বারা জনসাধারণের মনে বিভ্রম জন্মাইয়া তাহারা স্বেচ্ছাসেবকগণকে বাধা দিতেছে।

"কেহ কেহ অবার এই পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলিতে অনিচ্ছুক। গবর্ণমেণ্ট এই পতাকাকে স্বীকার করিয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। পতাকা সংগ্রামের প্রতীক এবং প্রতিপক্ষ স্বীকার করিলেই ইহা পতাকার মর্যাদা লাভ করে। আমাদের পতাকার

দিকে তাকাইলেই আপনারা আমাদের সংগ্রামের প্রণালী বুঝিতে পারিবেন। আমাদের পতাকায় ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদির স্থান নাই।—আছে শুধু একটি চরকা। ইহা শ্রম ও শুভেচ্ছার প্রতীক। পশুশক্তির বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের নবোদ্ভাবিত অস্ত্র। আমরা পতাকার বুকে একটি বন্দুক অঙ্কিত করিলে গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিত না, কারণ প্রচণ্ডতর শক্তিসম্পন্ন বন্দুক তাহাদের আছে। কিন্তু একটি চরকা ত্রিশ কোটি চরকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহার শক্তি প্রতিরোধ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। অতএব আমি আশা করি যে, আইনের এই অপব্যবহার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন।”

নাগপুর পতাকা-সত্যাগ্রহ অল্পদিনের মধ্যেই সর্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত হইল। ইতিমধ্যে শেঠ যমুনালাল বাজাজ সত্যাগ্রহ করিয়া গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে ৩০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় শেঠজীর মোটর গাড়ী ক্রোক করা হয়। কিন্তু নাগপুরে কোন ক্রেতা না জোটায় অগত্যা গবর্ণমেণ্ট উহা কাথিয়াবাড়ে লইয়া যায় এবং সেখানকার এক দেশীয় নৃপতির নিকট উহা বিক্রী করে। ১৯২৩ সনের ৮ই, ৯ই ও ১০ই জুলাই নাগপুরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকে স্থির হয় যে পতাকা-সত্যাগ্রহ চালাইবার উদ্দেশ্যে নাগপুরের সত্যাগ্রহ-সমিতিগুলিকে সর্বপ্রকার সহায়তা দেওয়া হইবে। মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সনের ১৮ই মার্চ ৬ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই হইতে গান্ধীজী মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত প্রতি মাসের

১৮ই 'গান্ধী দিবস' পালন করা হইত। স্থির হয় যে, পরবর্তী 'গান্ধী দিবস' অর্থাৎ ১৮ই জুলাই, ১৯২৩—'পতাকা-দিবস' হিসাবে ভারতের সর্বত্র প্রতিপালিত হইবে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলিকে উক্ত মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুরোধে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নাগপুর পতাকা-সত্যাগ্রহের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সত্যাগ্রহিগণ দলে দলে নাগপুরের দিকে অভিযান করিতে থাকেন। বাংলা দেশ হইতেও কয়েকদল সত্যাগ্রহী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে নাগপুর যাত্রা করেন। জেলে সত্যাগ্রহীদের উপর নানারূপ অত্যাচার করা হয় এবং তাহাদেব প্রায় সকলেই কারাদণ্ড ভোগের পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। সর্দার প্যাটেলের অক্লান্ত চেষ্টায় নাগপুব সত্যাগ্রহ অচিরেই জয়যুক্ত হয়। ১৮ই আগষ্ট পতাকাসহ এক শোভাযাত্রা বাহির হইবে স্থির হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পূর্ব হইতেই ঘোষণা করিয়া দেন কখন কোন্ পথে শোভাযাত্রা পরিচালিত হইবে। শেষ পর্যন্ত জনশক্তির নিকট সরকারকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। সরকার শোভাযাত্রার পথ রোধ করিতে সাহস পায় না।

নাগপুর সত্যাগ্রহের ফলে জাতীয় পতাকার জনপ্রিয়তা বহুগুণে বাড়িয়া গেল। এমন কি, যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও পতাকাটিকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ

করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে পতাকা যত সমাদর লাভ করিতে লাগিল, বর্ণ তিনটির সম্প্রদায়গত ব্যাখ্যা ততই জনপ্রিয়তা হারাইতে লাগিল। জনৈক মহিলা পতাকার লাল রংকে সাহস, সবুজকে স্থৈর্য ও সাদাকে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। মহাত্মাজী সাদরে এই নূতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' তিনি লিখিলেন :—

"আমি যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম, তাহার স্থলে এই নূতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই। বিরোধী সম্প্রদায়ের তুষ্টি বিধানের জন্যই যাহা করা হইয়াছিল, হৃদয়ের ঐক্য সাধিত হইলে তাহা স্মরণ না করাই ভাল। আমরা ঐক্যবদ্ধ হইলে পুরাতন বিভেদের কথা স্মরণ করিবার পরিবর্তে যত শীঘ্র উহা ভুলিয়া যাইতে পারি ততই মঙ্গল। কিন্তু আমাদিগকে সর্বদাই সাহস, স্থৈর্য ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই নূতন ব্যাখ্যা বর্ণ সম্বন্ধে সকল মতভেদ দূর করিতে পারিবে আশা রাখি। কিন্তু চরকার স্থান সম্বন্ধে কেহ আপত্তি তুলিলে তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। চরকার মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যাহা ধনী ও দরিদ্রকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে এবং যাহা প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেয় যে তাহারা যাহাই করুক না কেন, জনসাধারণের মঙ্গলের চিন্তা তাহারা কখনই ভুলিতে পারেন না।"

কিন্তু গান্ধীজী নূতন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ পুরাতন ব্যাখ্যাই বক্তৃতায়, লেখায় ইত্যাদিতে প্রচার করিতে থাকেন। ফলে শিখগণ পুনরায় প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হওয়া

উচিত তাহা জানিতে চাহিবার পরিবর্তে স্বীয় সম্প্রদায়ের বর্ণটিকে পতাকার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। লাহোরে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশনেব সময় তাহারা এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করে। কিন্তু কংগ্রেস তখন গণ-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া তাহাদের প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়। ১৯৩০ সনের "লবণ আইন অমান্য" আন্দোলন পুরাতন পতাকাকে কেন্দ্র করিয়াই চালানো হয়। যুগান্তকারী সেই আন্দোলনেও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে কত কংগ্রেসকর্মী যে পতাকার গৌরব রক্ষার জন্য লাঞ্ছিত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় তাহার সংখ্যা নাই। এই আন্দোলনে কংগ্রেস আংশিক জয়লাভ করিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে আন্দোলনের সাময়িক পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু পতাকা সম্বন্ধে বাদ-বিতণ্ডা আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠে। ১৯৩১ সনে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় শিখগণ তাহাদের দাবী পুনরায় উত্থাপন করে। তখন পতাকা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি একটি কমিটি নিয়োগ করেন :—

১। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

২। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

৩। ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া

৪। ডাঃ এন, এস, হার্দিকর

৫। শ্রীযুক্ত ডি, বি, কালিলকর

৬। মাষ্টার তারা সিং

৭। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

জাতীয় পতাকা-কমিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করিয়া অবশেষে একটি নূতন পতাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ পতাকাটি হইবে জাফরান রংয়ের, বাম দিকে উপরে অঙ্কিত থাকিবে একটি চরকা। কিন্তু পতাকা-কমিটির এই সুপারিশ নানা কারণে গৃহীত হয় না।

১৯৩১ সনের ৪ঠা হইতে ৭ই আগষ্ট বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। পতাকা-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিলেন যে, জাতীয় পতাকায় সম্প্রদায়বিশেষের প্রতীক থাকা অনুচিত। অন্য কোন দেশের পতাকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, আমাদের পতাকা এরূপ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। অপর পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটি তৎকালীন জাতীয় পতাকার খুব বড় রকমের পরিবর্তন করিবারও পক্ষপাতী ছিলেন না। সকল দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট একটি নূতন পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা গ্রহণের নিমিত্ত সুপারিশ করেন। এই নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী পতাকাটিতে পূর্বের ন্যায় তিনটি বর্ণের সমাবেশ থাকিল বটে, তবে বর্ণ তিনটি

হইল উপর হইতে নীচে যথাক্রমে জাফরান, সাদা ও সবুজ ; মধ্যে সাদা অংশে শোভা পাইল একটি চরকা। বর্ণ তিনটি বিভিন্ন গুণাবলীর পরিচায়ক, সম্প্রদায়ের নহে। বোম্বাইতে ঐ সময়েই (৬ই, ৭ই ও ৮ই আগস্ট, ১৯৩১) নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয়। উক্ত সমিতি বিচার-বিবেচনার পর ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া পতাকা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঃ—

"জাতীয় পতাকাটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত হইবে। বর্ণ তিনটি পূর্বের ন্যায়ই সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকিবে। উপর হইতে নীচে যথাক্রমে থাকিবে জাফরান, সাদা ও সবুজ রং। সাদা অংশের কেন্দ্রস্থলে শোভা পাইবে গাঢ় নীলবর্ণের একটি চরকা। বর্ণগুলির কোন সম্প্রদায়গত অর্থ থাকিবে না। জাফরান রংয়ের অর্থ হইবে সাহস ও ত্যাগ, সাদার অর্থ শান্তি ও সত্য, এবং সবুজ বুঝাইবে বিশ্বাস ও শৌর্য ; চরকা হইবে জন-সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। পতাকাটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থের দেড়গুণ লম্বা হইবে।"

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি তারও প্রস্তাব করিলেন যে ৩০শে আগষ্ট এবং প্রতি মাসের শেষ রবিবার 'পতাকা-দিবস' হিসাবে যেন পালন করা হয়।

কংগ্রেস নির্ধারিত এই পতাকাই অতঃপর ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়। পূর্বের পতাকাটি মহাত্মাজী কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে কংগ্রেস উহাকে জাতীয় পতাকা

বলিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। নবোদ্ভাবিত এই জাতীয় পতাকা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে থাকিয়া শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল।

জাতীয় পতাকা মৃতপ্রায় ভারতবাসীকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিল, জাতির প্রাণে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিল। দেশের মুক্তির জন্য যখনই কোন সংগ্রামের আহ্বান আসিয়াছে, দলে দলে স্বেচ্ছাসৈনিক জাতীয় পতাকার পাদদেশে আসিয়া সমবেত হইয়াছে, জাতীয় পতাকা হাতে লইয়াই দৃঢ় পাদনিক্ষেপে তাহারা নিশ্চিত মরণের মুখে অগ্রসর হইয়াছে। এই জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করিয়াই বিদেশী শাসনের অত্যাচার নির্মম রূপ ধারণ করিয়াছে। ১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৩ এবং ১৯৪২-৪৪ সনের দেশব্যাপী আন্দোলনে সরকারী পেষণযন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিল জাতীয় পতাকা।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের বাহিরে যে আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করেন তাহার পতাকাও ছিল কংগ্রেস নির্ধারিত এই জাতীয় পতাকা এবং এই পতাকা লইয়াই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ব্রহ্মে ও মণিপুরে তাহাদের বিজয় অভিযান চালাইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ

১৯৩৯ সালে হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একে

একে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালি, রুশিয়া, চীন, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তি ইহাতে জড়িত হইয়া পড়ে এবং দীর্ঘ সাত বৎসর কাল পৃথিবী জুড়িয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্য চলিতে থাকে। তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতেও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ভারতবর্ষের যাবতীয় সম্পদ ও জনশক্তি সমর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করে নাই—বরং সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামই করিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পর ১৯৪২ সালে শুরু হইল স্বাধীনতা-সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়—“ভারত-ছাড়” আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনের পূর্বাহ্নে কারারুদ্ধ করিয়াও স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতিবেগ রুদ্ধ করা সম্ভব হইল না। সমগ্র ভারতবর্ষে “ভারত-ছাড়” আন্দোলন দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। শুরু হইল অহিংস ভারতবাসীর বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সৈন্যদলের অভিযান। লক্ষ লক্ষ লোক কারাগারে বন্দী হইল, পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলীতে, সঙ্গীনে হতাহত হইল অসংখ্য নরনারী। ইহার উপর দেশের খাদ্য বিদেশে পাঠাইয়া

দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়া লক্ষ লক্ষ নির্দোষ, নিরপরাধ বাঙ্গালীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইল।

বৃটিশ সমরযন্ত্রের পেষণে সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ভারত ছাড়িতেই হইবে এই ধারণা ইংরেজের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সৃষ্ট আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের ব্রহ্ম ও আসামের মরণ-বিজয়ী-সংগ্রাম তাহাদের এই আশঙ্কাকে দৃঢ়তর করিয়া দিল। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বারুদের স্তূপের মতই অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হইবে এবং সে আগুন নিভাইবার সাধ্য কাহারও থাকিবে না—এ বিষয়ে ইংরেজের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তাই জার্মান যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে চার্চিল গভর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্তি প্রদান করিয়া অসন্তুষ্ট ভারতের সঙ্গে একটা আপোষ করার চেষ্টা করে। সিমলায় তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হইয়া আলাপ-আলোচনা সুরু করেন। কিন্তু নানা কারণে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইহার কিছুকাল পরেই ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচনের ফলে চার্চিল মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং মিঃ এট্‌লীর নেতৃত্বে শ্রমিকদল শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মিঃ এট্‌লী ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা

দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কি প্রকারে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহার উপায় নির্ধারণ করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট তিনজন মন্ত্রীকে (লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং মিঃ আলেকজাণ্ডার) ভারতে প্রেরণ করেন। এই মন্ত্রীমিশন কিঞ্চিদধিক তিন মাস ভারতে অবস্থান করিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করেন এবং অবশেষে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটি কাঠামো রচনা করেন। ইহাই বিখ্যাত মন্ত্রীমিশন-পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পর বৃটিশ ভারত ও সামন্তরাজ-শাসিত ভারত একই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিবে। প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একটি কেন্দ্রীয় গণ-পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত গণ-পরিষদ ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে দেশরক্ষা, যানবাহন, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশসমূহ আভ্যন্তরীণ কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। তবে শাসনকার্যে সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি লইয়া তিনটি মণ্ডলী গঠিত হইবে :—

১। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

২। বাংলা ও আসাম।

৩। বাকী অন্যান্য প্রদেশ।

আরও ঠিক হইল যে প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র হইয়া নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। সুদূরপ্রসারী এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী নির্বাচনের ভার ভারতীয়দের উপর ছাড়িয়া দিবার জন্যও মন্ত্রীমিশন সুপারিশ করেন। কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া সামান্য কিছু রদবদল করাইয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। কিন্তু মুসলীম লীগ প্রথমে উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করিবার পর উহা বর্জন করেন। এদিকে গণপরিষদের নির্বাচন চলিতে থাকে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ বিপুল ভোটাধিক্যে যথাক্রমে প্রায় সকল হিন্দু ও মুসলমান আসন দখল করে। মুসলীম লীগ বর্জন করিলেও অন্যান্য সভ্যদের উপস্থিতিতে গণ-পরিষদের অধিবেশন চলিতে থাকে এবং শাসনতন্ত্র রচনার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। কিছুদিন পর বড়লাটের আমন্ত্রণে মুসলীম লীগ অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করে বটে, কিন্তু গণ-পরিষদে যোগদান করিতে বিরত থাকে।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় হিন্দু-মুসলীম দাঙ্গা সুরু হয়। উহাতে সহস্র সহস্র লোক হতাহত হয়। এই দাঙ্গা শান্ত হইতে না হইতেই পূর্ববঙ্গের

নোয়াখালীতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে। ক্রমশঃ ব্যাপক এবং অধিকতর ভয়াবহরূপে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সাম্প্রদায়িকতার এই উন্মত্ত তাণ্ডব ছড়াইয়া পড়ে। একদল লোক স্পষ্টভাবেই বলিতে থাকে যে, ভারত বিভাগ না হইলে এই উন্মত্ততার উপশম হইবে না। অপর দিকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করা হইবে। কিন্তু এদিকে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া না থাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর কাহার কাছে করা হইবে, তাহা লইয়া মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তি তাহাতে বৃদ্ধির দিকেই যায়। ফলে অনিবার্যরূপে ভারত বিভাগের প্রশ্ন সকলের মনকেই নাড়া দিতে থাকে। ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন নীতি যাহাতে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা হয় সেই উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভা তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ভারতে আসিয়া লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনার পর বৃটিশ মন্ত্রীসভার নিকট ভারত বিভাগের একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। কংগ্রেস মুসলীম লীগ কর্তৃপক্ষ ভারত বিভাগে

সম্মত হন এবং নবাগত বড়লাট লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় সমগ্র বৃটিশশাসিত ভারত পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে পড়ে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের পশ্চিম অর্ধাংশ; আর পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে বাংলার পূর্ব অর্ধাংশ ও শ্রীহট্ট জেলা (শ্রীহট্ট জেলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সাধারণ গণভোটের ফল অনুযায়ী পাকিস্তানে যোগদান করে)। বাকী অন্যান্য প্রদেশ—বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব একত্রে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ গোলমাল যাহাতে অবিলম্বে থামিয়া যায় তাহার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৫ই আগষ্টের পরে পাকিস্তান ইউনিয়ন ও ভারতীয় ইউনিয়ন এই দুইটি স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ পাইবে স্থির করা হয়। এমতাবস্থায় দুইটি পৃথক রাজ্য হিসাবে এই দুই ইউনিয়নেরই রাষ্ট্র-পরিচালকগণ পূর্ব হইতেই আপন আপন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার কথা চিন্তা করিতে থাকেন।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা

১৯৪৭ সনের ২২শে জুলাই ভারতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গণ-পরিষদে জাতীয় পতাকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ঃ—সমান্তরালভাবে সজ্জিত গাঢ় জাফরাণ, সাদা ও সবুজ—এই তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরী হইবে। সাদা অংশের কেন্দ্রস্থলে চরকার প্রতীক হিসাবে শোভা পাইবে গাঢ় নীল রংয়ের চক্র। এই চক্র সারনাথের অশোকস্তম্ভের উপর অঙ্কিত অশোক-চক্রের অনুরূপ এবং ইহার ব্যাস হইবে পতাকার সাদা অংশের প্রস্থের সমান। সাধারণতঃ পতাকা দৈর্ঘ্যে প্রস্থের দেড় গুণ হইবে।

এই প্রস্তাবে পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পতাকারই অনুরূপ। পার্থক্যেব মধ্যে শুধু মধ্যের সাদা অংশে চরকার স্থানে চরকারই প্রতীক হিসাবে অশোকচক্রকে স্থান দেওয়া হইল। বিভিন্ন বর্ণের ব্যাখ্যা বা তাৎপর্যের কোন পরিবর্তন করা হইল না।

পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার বক্তৃতায় পতাকার আদর্শ এবং কেন এই পতাকা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ—

"বলিতে গেলে এই পতাকা ঠিক কোন প্রস্তাব পাশ

করিয়া সরকারীভাবে কখনই গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার পিছনে আছে জন-সাধারণের স্বীকৃতি ও সার্বজনীন ব্যবহার এবং সর্বোপরি পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিকদের আত্মবলি। আমরা জনমতকেই সমর্থন করিতেছি মাত্র। বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে এই পতাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ ভুল বুঝিয়া পতাকার বর্ণ তিনটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু একথা আমি বলিতে পারি যে, পতাকা উদ্ভাবনের সময় ইহার পিছনে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ছিল না। আমরা একটি সুদৃশ্য পতাকার কথাই ভাবিয়াছিলাম। কারণ, একটি জাতির প্রতীক চিহ্ন সুদৃশ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের কল্পনা ছিল যে, আমাদের দেশের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, কর্মধারা—যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতির সমগ্র অংশে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া আসিতেছে, তাহা যেন এই পতাকার বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া ওঠে। ইহাই ছিল পতাকা পরিকল্পনার গোড়ার কথা। শুধু চারুকলার দিক দিয়া বিচার করিলেও আমাদের এই পতাকা খুব সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহা ছাড়া মন ও আত্মার বিকাশ লাভের উপযোগী আরও অনেক জিনিষ ইহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহা শুধু ব্যক্তিবিশেষের জন্যই প্রয়োজন নহে, জাতির উন্নতির পক্ষেও অপরিহার্য।

"এতকাল আমরা যে পতাকা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি

তাহারই সামান্য একটু পরিবর্তন করিয়া বর্তমান পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। পতাকায় পূর্বেকার মতই গাঢ় জাফরান, সাদা ও সবুজ বর্ণের সমাবেশ রহিয়াছে। সাদা অংশে পূর্বে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শ্রমের প্রতীক হিসাবে একটি চরকা অঙ্কিত ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে আমরা এই চরকার বাণী গ্রহণ করিয়াছি। বর্তমান পরিকল্পনায় এই চরকাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয় নাই, সামান্য পবিবর্তন করা হইয়াছে মাত্র। কেন এই পরিবর্তন করা হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—সাধারণতঃ পতাকার এক পৃষ্ঠে যে প্রতীক চিহ্ন থাকে, অপর দিকেও অনুরূপ চিহ্ন থাকা উচিত। তাহা না হইলে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম হয়। পূর্বেকার পতাকায় অঙ্কিত চরকার চক্র একদিকে এবং টাকু অন্যদিকে থাকায় বিপরীত দিক হইতে দেখিলে চক্র ও টাকু উল্টা দিকে দেখায়। চক্রটি পতাকা দণ্ডের দিকে অবস্থিত থাকিবার কথা—পতাকার অগ্রভাগে নহে। চরকার এই সব ব্যবহারিক অসুবিধা রহিয়াছে। প্রতীক হিসাবে চরকা এতকাল জন-সাধারণের মনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে পতাকার বুকে চরকা রাখিতে হয়। কিন্তু অন্য অসুবিধাটুকুও দূর করা দরকার। তাই মালদড়ি ও টাকু—অসুবিধাজনক এই দুই অংশ বাদ দিয়া চরকার মূল অংশ চক্রটিকে পতাকার বুকে স্থান দেওয়া হইল।

"অতএব চরকার স্থান অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ প্রকারের চক্র আমাদের গ্রহণ করা উচিত? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা অনেক চক্রের কথাই ভাবিয়াছি। কিন্তু অবশেষে সারনাথের অশোকস্তম্ভের উপরে অঙ্কিত বিখ্যাত চক্রের প্রতিই আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই চক্র ভারতের অতীত সংস্কৃতির প্রতীক, প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রতীক হিসাবে পতাকার বুকে এই চক্রেরই স্থান পাওয়া উচিত। এই চক্রের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের—শুধু ভারতের কেন সমগ্র জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজ অশোকের নামের সহিত আমাদের জাতীয় পতাকার সংযোগ সাধিত হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি!"

পতাকার আকার সম্বন্ধে জওহরলাল বলেন :—"প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে সাধারণতঃ পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ হইবে। 'সাধারণতঃ' কথাটি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই পরিমাপ অপরিবর্তনীয় নহে। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে মাপের সামান্য অদল বদল হইতেও পারে; মাপ সম্বন্ধে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বাঁধাধরা মাপ ঠিক রাখাই বড় প্রশ্ন নয়—আসল কথা হইতেছে স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী পতাকা তৈরী করা।"

পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাবিত অশোকচক্রসমন্বিত ত্রিবর্ণ পতাকা গণ-পরিষদ কর্তৃক জাতীয় পাতাকারূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং পরিষদের মুসলীম লীগ সদস্যগণও উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও পতাকায় চরকার পরিবর্তে চক্র সংযোজন করার ফলে নানারূপে জল্পনা-কল্পনা হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের কথা চিন্তা করিয়াই উক্ত চক্র অঙ্কিত হইয়াছে। কেহ বলেন, স্বাধীন ভারতে চরকা ও খাদির স্থান থাকিবে না, তাই কুটীরশিল্পের প্রতীক চরকার স্থলে যন্ত্রচালিত বৃহৎ কলকারখানার প্রতীক চক্র নীতির পরিবর্তন সূচিত করিতেছে। আবার কেহ বা বলেন যে, কংগ্রেস স্বাধীন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেস পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় পতাকার প্রবর্তন কবেন। কাজেই, গণ-পরিষদে গৃহীত জাতীয় পতাকা সমন্ধে তাঁহার মতামত বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। ৩রা আগষ্ট তারিখের "হরিজনে"—তিনি লিখলেন :—

"জাতীয় পতাকা ঠিক ঐ নামে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল জাতি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা বলেন, যে পতাকা একদা কংগ্রেস পতাকা ছিল, তাহাই এখন ভারতের জাতীয় পতাকা হইয়াছে, তাঁহারা ভুল বলেন। ঐ পতাকাকে তাঁহারাই মাত্র আজ জাতীয়

পতাকা বলিতেছেন এবং তাহা লইয়া অযথা হৈ চৈ করিয়া না জানিয়া তাঁহারা কংগ্রেসকে অপমান করিতেছেন। ১৮৮৫ সালে জন্ম হইতেই কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া আছে। কংগ্রেস কখনও একটা দলের প্রতিনিধি হয় নাই; সকল দল এবং সকল ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্বই সে করিয়াছে। অবশ্য এই বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান দলবিশেষের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যে কোন দিন আত্মহত্যা করিতে পারে, সে পথ তাহার খোলা আছে। ভগবানের রোষ যদি কংগ্রেসের উপর নামিয়া আসে, তবে ঐ সর্বনাশ ঘটিতে পারে। তথাপি ঐ দুর্ভাগ্য যাহাতে কখনও আপতিত না হয় তাহার জন্য অনেকেই প্রার্থনা করিবে। কংগ্রেস শুধু নামেই জাতীয় কিন্তু আসলে হিন্দু প্রতিষ্ঠান, কায়েদ-এ-আজমের এই ব্যঙ্গোক্তি কখনও সত্য হইবে, ইহা কি সম্ভব ?

"উপস্থিত শুধু পতাকার কথাই ধরা যাউক। যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই যে, কংগ্রেস ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করিবার প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস বৃটিশ প্রভুত্ব হইতে ভারতকে মুক্তি দিয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে ভারতের বৃহত্তম অংশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং, কংগ্রেস যে-পতাকার তলে হিংসার আশ্রয় না লইয়া বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অনেক লড়াই লড়িয়াছে, স্বদেশী সরকার এখন সেই পতাকার তলে নিজ কর্ম করিয়া যাইবে। অতএব পতাকা উড়াইয়া নাচানাচি করিবার কারণ

তো কিছু আমি দেখি না। হিমালয়ে আরোহণ করিলে বিভিন্ন স্তরের বিবিধ ও বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া যে আনন্দ ও উদ্দীপনা জন্মে, শীর্ষদেশে পৌঁছিয়া তাহা আর উপভোগ করা যায় না। লক্ষ্যে যে আজও কেহ পৌঁছাইতে পারিল না, ইহা দ্বারা এই সত্যই শুধু স্পষ্টীকৃত হয় যে, লক্ষ্য চিরকালই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে কিন্তু নাগালের বাহিরে থাকে, আর আনন্দ সেই লক্ষ্যের সাধনে—সেইখানে পৌঁছিবার চেষ্টায়।

কেহ কেহ বলেন, আদি পতাকা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে, এক পুরুষ চলিয়া গিয়া এখন নূতন এক পুরুষ সুরু হইয়াছে; তাহার সহিত নূতন এক কালোপযোগী ভাব ও ধারণাও আসিয়াছে। কিন্তু আমি তো আজও এমন কোন যোগ্য সন্তান দেখি নাই, যাহার চোখে তাহার মা বুড়া হইয়াছেন বলিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। খাঁটি সোনাকে সোনালী করার চিন্তা করাও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাপ-মার চাকচিক্য-বিধান করিতে চায় এমন ছেলে তো আজও জন্মে নাই। সুতরাং আমার মতো আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ আদি পতাকার উপর হাত দিবার কথা যদি না ভাবিতেন, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত না। পতাকার যে উন্নতি বিধান করা হইয়াছে তাহার সমর্থনে কেহ কেহ বলেন, "চরকা বৃদ্ধার সান্ত্বনা আর গান্ধীর খেলনা, কিন্তু স্বরাজ তো বুড়ো মানুষের নয়, স্বরাজ বীরের। অতএব অশোক রাজার সিংহাসন চক্র আমরা চাই। পতাকার চক্রে সিংহ

যদি না থাকে তো সে শুধু আর্টের খাতিরে। পতাকার মধ্যে সিংহকে ধরিবে না, কিন্তু চক্রের কোথাও সিংহের স্থান না হওয়া পর্যন্ত আমরা খুসী হইব না। কাপুরুষতা যথেষ্ট তো হইয়াছে। সাহসীর অহিংসা কি, আজও কেহ দেখি নাই। যখন দেখিব তখন সেই বিষয়ে কথা বলিব। এইটুকু আমরা জানি যে, বনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হইল সিংহ। ছাগল, ভেড়া তাহার খোরাক। এই প্রগতির যুগে খাদি ব্যবহারে আমাদের আর রুচি নাই। আজ কাচ হইতে মনোরম বস্ত্র তৈয়ারি হইতেছে। বৃষ্টি বাতাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আজ আমরা বস্ত্র ব্যবহার করি দেহের শোভার জন্য। সুতরাং এমন স্বচ্ছ বস্ত্র চাই, যাহার মধ্য দিয়া দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ শোভন ভাবে দেখা যাইবে আর উন্নত ধরণের পতাকার জন্য খাদির প্রয়োজন নাই। খাদি রাখিয়া আমাদের সহরের দোকানগুলির জানালা বিশ্রী হইতে দিব না। গ্রামের লোকে খাদি পরিলে আর বুড়ীরা চরকা কাটিলে আমরা যদি তাহা অপরাধ বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলেই আমাদের সুখ্যাতি করা উচিত।”

“পতাকার অর্থ যদি ঐরূপ হয়, তবে বাহার তার যত খুসী হউক, আমি সে পতাকাকে অভিবাদন করিতে অস্বীকার করিব।

“আর একদল পতাকার অর্থ করিয়া বলেন, ‘আদি

পতাকাকে একটুখানি ভাল করিয়া এই নূতন পতাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে চরকার মর্যাদার স্থান নিঃসন্দেহেই রহিয়াছে। শোভা রক্ষার জন্য যদি নূতন পতাকায় চরকায় টাকু ও মাল না দেওয়া থাকে, তবে তাহাকে যেন অঙ্গহানি বলিয়া ধরা না হয়। কারণ, প্রত্যেক চিত্রে কল্পনার কিছুটা স্থান থাকে। চরকার ছবিতে তো দেখা যায় না যে কাটুনী পাঁজ হাতে সূতা কাটিতেছে। মানুষের কল্পনা সেই ফাঁকটুকু ভরিয়া দেয়। আদি চরকার যে উন্নত সংস্করণ হইয়াছে, তাহার বেলায়ও এই নিয়ম খাটে। এই ভাবে ধরিলে নিরপেক্ষ মনে পরিবর্তনটি নির্দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। চক্রসমন্বিত এই ত্রিবর্ণ পতাকা নিশ্চয়ই হাতে কাটা সূতায়, হাতে বোনা খাদিতে তৈয়ার হইবে। কার্পাসের হউক বা রেশমের হউক, হাতে কাটা সূতায় তৈরী বস্ত্রকে আমাদের দেশে খাদি বলা হইয়াছে। আদি পরিকল্পনা যখন অক্ষত রাখা হইয়াছে, তখন আর্টের একটু স্পর্শ ঘটিয়াছে বলিয়া কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। ইচ্ছা করিয়া আমরা উহাকে অসুন্দর করিব না। দেশ যখন বৈদেশিক শক্তির সহিত সংগ্রামে রত ছিল, তখন সেই অবস্থাটাই একটা আর্টের ব্যাপার ছিল। আজ তো সে সংগ্রাম সফল হইয়াছে, এখন আর্টের স্থান থাকা চাই। সে আর্ট হয় তো নিম্নস্তরের হইবে, তথাপি একটা দুর্বল জাতির পক্ষে যেটুকু সাহস দেখান সম্ভব হইয়াছে, তাহারই স্মৃতিরক্ষার কারণে ঐ আর্টের প্রয়োজন আছে। পতাকার যে অর্থটুকু

দেওয়া হইল ইহা তো অনিবার্য। ইহার অধিক কিন্তু ইহার বিরোধী নহে, এইরূপ অন্য অর্থ যদি যোগ করা যায়, তবে সেই বিস্তারটুকু নিশ্চয়ই নির্দোষ হইবে। সমৃদ্ধ মন পতাকার বর্ণগুলিতে সূক্ষ্ম অর্থ দেখিবে। সারা জগতে বর্ণের বৈচিত্র্যের মধ্যেই কল্পনার ঐক্য রহিয়াছে। চক্রটি দেখিয়া কাহারও অশোকের নাম মনে পড়িবে -সেই শক্তির সম্রাট, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যিনি অবশেষে ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের সকল নিদর্শন পরিহার করিয়া, মানুষের হৃদয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হইয়া, তৎকালপ্রচলিত সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়াছিলেন। এই চক্রের মধ্যে কেহ যদি ধর্মচক্রের সন্ধান করে—যে চক্র করুণা ও প্রেমের জীবন্ত উৎস সেই ভগবান তথাগত প্রবর্তন করিয়াছিলেন—তবে তাহার সেই সন্ধানকে আমরা সঙ্গত বলিব। চক্রের এইরূপ অর্থ কোটি কোটি মানুষের জীবনের মূল্য বাড়াইয়া দিবে। যে চরকাকে সামান্য জ্ঞান করা হয় অশোক-চক্র হইতে যদি ইহার উৎপত্তি এবং তাহার সহিত যদি ইহার তুলনা হয়, তবে ভগবানের প্রেমের যে চক্র নিয়ত ঘূর্ণমান রহিয়াছে, তাহারই কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা সেই সামান্যের মধ্যেই বুঝিতে পারা যায়।” (হরিজন পত্রিকা হইতে)।

এদিকে জাতীয় পতাকার নানারূপ বিকৃত ব্যাখ্যা হইতে থাকায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সকল সন্দেহ নিরসনকল্পে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন ঃ—

“আমার তো মনে হয়, পতাকার প্রতিরূপ সম্বন্ধে যে

সকল সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহার কোনটিরও যুক্তি আমার মনে লাগে নাই। আমার অভিমত এই যে, পতাকার যে প্রতিরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে, সৌন্দর্যের দিক্ হইতে এবং প্রতীক হিসাবে তাহাতে পতাকার সমূহ অর্থের পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে।

"সর্বোপরি, পতাকা তো একটি প্রতীক। চরকা-চিত্রযুক্ত আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা বহু বৎসর ধরিয়া আমাদেব কাছে স্বাধীনতা, ঐক্য এবং ভারতীয় জনগণের সহিত সংযুক্তির প্রতীক হইয়া আছে। পতাকাকে কেন্দ্র করিয়া যে ভাবরাশি ও সঙ্কেত-ব্যঞ্জনা পুঞ্জিত হইয়াছে, তাহাকে বিপর্যস্ত না করিয়া পতাকার কোন মূল পরিবর্তন করা সম্ভব হইত না। বিশেষ বিবেচনার পব এই পতাকা প্রথমে গ্রহণ কবা হয়। আমার মনে হয়, পতাকার বর্ণের নির্বাচন ও ব্যবস্থা খুবই মনোরম ও রুচিসঙ্গত হইয়াছে। পতাকার পরিকল্পনায় চরকা একটি অভিনব সৌন্দর্য দান করিয়াছে। পতাকার এখন চরকার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নাই বলিয়া একথা যেন কখন মনে করা না হয় যে, আমরা চবকা ও চরকা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছাড়িয়া দিয়াছি। গণ-পরিষদের প্রস্তাবে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, পতাকার কেন্দ্রে যে চক্র আছে, উহাই চরকা। চরকার এই প্রতীকরূপ উহার সমগ্র অংশ ধারণ করিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে পূর্বের ভাবরাশি বাহিত ও রক্ষিত হইয়াছে, কেবল উহার রূপ

আরও স্পষ্ট, সুন্দর এবং পতাকার অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

"চরকার ঐ রূপটি হঠাৎ নির্বাচন করা হয় নাই— অশোকস্তম্ভের শীর্ষে যে চক্র আছে, উহা তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে। চক্রটি অবশ্য অশোকের আবিষ্কার নহে, উহা অশোকের পূর্বকালের। কিন্তু উহা অশোকের নামের সহিত জড়িত এবং অশোকস্তম্ভের উপর উহা দৃষ্ট হয়। সেইজন্য ঐ বিশেষ রূপটি গ্রহণ করিবার উৎসাহ আরও অধিক হইয়াছে।"

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, পতাকার চক্রটি আরও বড় হওয়া উচিত ছিল এবং সবুজ ও গৈরিক অংশের কতকটা চক্রের দ্বারা আবৃত হইলে ভাল হইত। যাহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা পতাকার সমগ্র পরিকল্পনা যে রূপদৃষ্টির পরিচয় আছে, তাহা বুঝেন নাই। চক্রটি ঐরূপে অঙ্কিত হইলে পতাকার সৌন্দর্য নষ্ট হইত।"

"কাজেই, যে রূপ দান করিয়া এখন পতাকাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে পতাকা-পরিকল্পনা হইতে আমরা যাহা কিছু চাই তাহা সবই পাইয়াছি। পতাকাটি সুন্দর এবং চারুকলা-সম্মত। ইহা মূলতঃ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিজয়ের পতাকা। এই পতাকায় ভারতের সাধারণ লোক ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। আবার আধুনিক হইয়াও এই পতাকা আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের মহান সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়।

ঐ সংস্কৃতির কতকটা তো যুগ যুগ ধরিয়া এই দেশে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ বুঝিলে, এই পতাকা ভারতীয় সংস্কৃতির স্থায়িত্ব এবং বর্তমান ভারতের গতিশীলতা—এই উভয়েরই পরিচায়ক। আমরা আশা করি, এই উভয় শক্তিই ভারতের জনসাধারণের উন্নতি ও মুক্তিকল্পে নিয়োজিত হইবে।" (হরিজন পত্রিকা হইতে)।

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের নিকট শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সরকারী ভবনসমূহে, প্রতি গৃহে এবং অগণিত সভা-শোভাযাত্রায় নূতনভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া আপামর ভারতবাসী স্বাধীনতা দিবস পালন করে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু দিল্লীর লাল কেল্লার উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়া তোলেন। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল ভারতবাসী পুরাতন দ্বন্দ্ব-কলহ বিস্মৃত হইয়া আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া নবলব্ধ স্বাধীনতাকে আবাহনী জানায়।

ভারতীয় গণ-পরিষদে গৃহীত বিধান অনুযায়ী ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী "প্রজাতন্ত্র দিবস" এবং ১৫ই আগষ্ট "স্বাধীনতা দিবস" রাষ্ট্রীয় উৎসব দিবস হিসাবে সরকারীভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। এই দুই দিন সরকারী ও বেসরকারী অফিস-

সমূহ বন্ধ থাকে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

জাতীয় পতাকায় চক্র

"ভাবতের জাতীয় পতাকায় অঙ্কিত চক্রটিকে বহু স্থলেই অশোকচক্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া এইরূপ বর্ণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। সম্রাট অশোক এই চক্র উদ্ভাবন কবেন নাই। সম্রাটেব বিশ্বপূজ্য মহাগুরু বুদ্ধদেবই ইহার পরিকল্পনা করেন। সারনাথে তাঁহাব প্রথম ব্যাখ্যানে এই চক্রটিকে তিনি 'ধম্ম-চক্ক' বলিয়া উল্লেখ কবেন। পালিভাষায় এই ব্যাখ্যানটি 'ধম্ম-চক্ক-পবত্তন-সুত্ত' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই কথাটির অর্থ ন্যায়ের রাজ্য (চক্র) প্রবর্তন—পশুবলেব স্থলে ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা—গান্ধীজী ইহাকেই রামবাজ্য বলিয়া থাকেন। এই আদর্শ ধরিয়াই ভাবত দাঁড়াইয়া আছে। বুদ্ধদেবের এই ধম্ম চক্ক আবার বিষ্ণু দেবতার সুদর্শন চক্রের অনুগামী। সুদর্শন চক্র হইল সৃষ্টিচক্র—ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু জীব বা জড় পদার্থ আছে; তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

অতএব এই চক্রের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। যে স্থানে বুদ্ধদেব প্রথম এই ধম্ম-চক্কের প্রবর্তন ও ইহার সুমহান আদর্শের ব্যাখ্যা করেন, সেই স্থানে প্রস্তরে

রূপ দিয়া এই চক্রের প্রতিষ্ঠা অশোকের কীর্তি। পরিশেষে এই চক্রকে গান্ধীজীর চরকা অর্থাৎ ভারতের আবহমান কালের অর্থনৈতিক ধারার প্রতীক চরকা বলিয়া ধরা যায়।” (হরিজন পত্রিকা)।

পতাকার আকার, বর্ণ ইত্যাদির গুরুত্ব

পতাকার বর্ণ, পরিমাপ এবং মধ্যস্থিত চক্র সম্বন্ধে গণ-পরিষদের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নানান ধরণের পতাকা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পতাকার দৈর্ঘ্যের ও প্রস্থের সামঞ্জস্য নাই, কোনটিতে চক্র নাই, আবার কোনটিতে হয়তো বা রংয়ের গোলমাল রহিয়াছে। ইহাতে জাতীয় পতাকার অগৌরবই করা হয়। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত উদ্ধৃত করিলাম :—

“জাতীয় পতাকার যে পরিমাপ নির্ধারিত হইয়াছে ঠিক তদনুরূপ না হইলে পতাকার সকল গুরুত্বই হ্রাস পায়। সাধারণ কোন জিনিষ নিতে হইলেও আমরা তাহার আকার, রং ইত্যাদি সন্তোষজনক কিনা দেখিতে চাহি। যে জাতীয় পতাকার মধ্যে আমাদের জীবন-মরণ নিহিত, তাহার প্রতি তো আমাদের আরও বেশী নজর দেওয়া কর্তব্য। জাতীয় পতাকা জাতির আত্মসম্মান, মর্যাদা, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সুতরাং মুদ্রার মতই ইহা স্বপ্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্দিষ্ট পরিমাপে গঠিত হইলেই ইহা আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা লাভ করে। অযত্নে প্রস্তুত কদাকার পাতাকা আমাদের ব্যক্তিগত তথা জাতীয় জীবনের কলঙ্কের কথা। এক টুকরা কাপড় কোনরকমে

একটু রং করিয়া পতাকা তৈরি করিলেই কী জাতীয় পতাকার ন্যায় গভীর সম্ভ্রমের উদ্রেক করিতে পারে?"

সাম্প্রদায়িক বা ধর্মপ্রচার-সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিম্নোক্ত মত প্রণিধানযোগ্য :—

"(জাতীয়) পতাকাটি কোন ধর্মের প্রতীক নহে। সুতরাং কোন সাম্প্রদায়িক সভায়, শোভাযাত্রায় বা মন্দিরে ইহার স্থান নাই। স্ব স্ব স্থানে প্রত্যেক জিনিসেরই মূল্য আছে, তাহার বাহিরে কোন মূল্যই নাই।"

পতাকা উত্তোলন দিবস

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ২৬শে জানুয়ারী "স্বাধীনতা দিবস" ১৩ই এপ্রিল "জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস" এবং ৯ই আগষ্ট "ভারত ছাড় আন্দোলন দিবস" উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র বিপুল আড়ম্বরের সহিত পতাকা আন্দোলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ব্যতীত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রধান হোতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস ২রা অক্টোবর তারিখেও আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলিত হইত।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সেই গৌরবময় দিবসটিকে চিরস্মণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তখন হইতে ১৫ই আগষ্ট তারিখটিকে "স্বাধীনতা দিবস" হিসাবে পালন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভারতের

সর্বত্র সরকারী এবং বেসরকারী অনুষ্ঠানে ঐ দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত নিজেকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। তদবধি "প্রজাতন্ত্র দিবস" হিসাবে ২৬শে জানুয়ারীও রাষ্ট্রীয় উৎসবের দিন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই দিনও সর্বত্র আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অবতরণ-বিধি

সাধারণতঃ কোন কংগ্রেস কমিটি, শিক্ষাশিবির বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতেই আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। বাংলা দেশে সচরাচর পতাকা উত্তোলন বা অবতরণের সময় কোন বাঁধাধরা নিয়ম সর্বত্র রক্ষিত হয় না। অথচ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এ সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি-বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। সর্ব-ভারতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে এগুলি বাংলায়ও পালন করা যুক্তিযুক্ত। তাই এই পুস্তকে উক্ত নিয়মাবলীর আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পতাকা-উত্তোলন সাধারণতঃ উন্মুক্ত মাঠে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বেচ্ছাসেবক, ধ্বজরক্ষক (Standard Bearer), অধ্যক্ষ বা সভাপতি, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, নিমন্ত্রিত অতিথি, বাদক, দর্শক প্রভৃতি সকলেরই দাঁড়াইবার

যদি কিছু বলিতে রাজী না হন তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে অনুষ্ঠান শেষ করিতে হইবে।

পতাকা অবতরণ

পতাকা উত্তোলনের সময়কার মত এবারও সকলে নিজ নিজ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইবেন। ধ্বজরক্ষক সকলকে 'সাবধান' আদেশ দিবার পর অধ্যক্ষকে অভিবাদন করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার অনুমতি লইবেন এবং নিজ স্থানে আসিয়া বাঁশী বাজাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে 'রাষ্ট্র গগন কী দিব্য জ্যোতি' গান সুরু হইবে। গান শেষ হইলে ধ্বজরক্ষক অধ্যক্ষকে অভিবাদন জানাইয়া তাঁহাকে পতাকা অবতরণের জন্য আহ্বান করিবেন এবং নিজে দড়ি খুলিয়া অধ্যক্ষের হাতে দিবেন। পতাকা অবতরণ-কালে সকলকে 'নমস্তে এক, দো' আদেশ দিবেন। পতাকা নামানো হইলে ধ্বজরক্ষক উহা ধরিবেন এবং অধ্যক্ষ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করিবেন। [illegible] ৬নং স্বেচ্ছাসেবক (নক্সা দেখুন) ধ্বজরক্ষকের নিকট [illegible] এবং পতাকা খুলিতে তাহাকে সাহায্য করিবে। পতা[illegible] খোলা হইলে স্বেচ্ছাসেবক তাহা নিজের কাছে রাখিবে। ধ্বজরক্ষক দড়িটি পতাকা-দণ্ডের সহিত বাঁধিয়া সময়োচিত ধ্বনি দিবেন এবং সকলকে 'কদম খোল' আদেশ দিবেন। অতঃপর তিনি স্বেচ্ছাসেবকটির সহযোগে পতাকা

ভাঁজ করিবেন। পতাকাটি ভাঁজ করিবার সময় প্রথমে লম্বালম্বি ভাবে প্রত্যেকটি রংকে দুই ভাঁজে ভাঁজ করিতে হইবে। পরে জাফরান রংটি যাহাতে উপরে এবং নীচে থাকে এমন ভাবে ছোট করিয়া ভাঁজ করিয়া ধ্বজরক্ষক পতাকাটি নিজের বাম বগলে রাখিবেন। স্বেচ্ছাসেবকটি তখন ধ্বজরক্ষককে অভিবাদন করিয়া নিজস্থানে চলিয়া যাইবে। ধ্বজরক্ষক অধ্যক্ষের নিকট যাইবেন। এবারকার ঘটনা একটু কৌতুকপ্রদ। সাধারণতঃ অধস্তন কর্মচারী উর্ধ্বতন কর্মচারীকে আগে অভিবাদন করে এবং উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রত্যভিবাদন করে। প্রত্যভিবাদন না করা রীতিবিগর্হিত। কিন্তু অপর একটি রীতি এই যে, পতাকা যাহার নিকট থাকে, সে যত অধস্তন কর্মচারী হউক না কেন, তাহাকে আগে অভিবাদন করিতেই হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ আগে ধ্বজরক্ষককে অভিবাদন করিবেন। অপর পক্ষে অধ্যক্ষ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মাননীয় ব্যক্তি বলিয়া ধ্বজরক্ষকেরও কর্তব্য তাঁহাকে আগে অভিবাদন করা। কাজেই উভয়ের অভিবাদন (বা প্রত্যভিবাদন) একই সঙ্গে হইবে। পরে ধ্বজরক্ষক দুই হাতে পতাকাটি ধরিয়া অধ্যক্ষকে দিলে অধ্যক্ষ তাহা দুই হাতে গ্রহণ করিবেন এবং নিজের বাম বগলে রাখিবেন। ইহার পর ধ্বজরক্ষক অধ্যক্ষকে পুনরায় অভিবাদন জানাইয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলে ৭নং স্বেচ্ছাসেবক অধ্যক্ষের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন

করিয়া দাঁড়াইবে। অধ্যক্ষ প্রত্যভিবাদন করিয়া দুই হাতে পতাকাটি তাহাকে দিবেন, স্বেচ্ছাসেবকটিও উহা দুই হাতে গ্রহণ করিয়া বাম বগলে রাখিবে। ইহার পর পূর্বোক্ত কারণে উভয়ে একই সঙ্গে পরস্পরকে অভিবাদন জানাইলে স্বেচ্ছাসেবকটি নিজ স্থানে চলিয়া যাইবে। অতঃপর 'সাবধান' আদেশ দিয়া ধ্বজরক্ষক বংশীধ্বনি করিলে 'বন্দে মাতরম্' গান হইবে। গান শেষ হইলে ধ্বজরক্ষক অধ্যক্ষের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কিছু বলিতে অনুরোধ করিবেন। অধ্যক্ষ সম্মত হইলে তিনি নিজ স্থানে আসিয়া সকলকে 'কদম খোল' আদেশ দিবেন। অধ্যক্ষের বক্তব্য শেষ হইলে পরবর্তী দিবসের কার্যসূচী ঘোষণা করিয়া সকলকে 'সাবধান' আদেশ দিবার পর 'বন্দন সমাপ্ত' আদেশ দিলে সকলে পতাকা উত্তোলনের সময়ের মতই 'দাহিনে রুখ' 'নমস্তে' করিয়া চতুষ্কোণের বাহিরে মার্চ করিয়া যাইবে এবং অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইবে।

———

পরিশিষ্ট

ভারতীয় স্বাধীনতার সনদ

এই গণ-পরিষদ ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র-রূপে ঘোষণা করার অনমনীয় সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে এবং এই দেশের ভবিষ্যৎ শাসনকার্যের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে।

এই ইউনিয়ন গঠিত হইবে সেই সকল এলাকা লইয়া যেগুলি বর্তমানে বৃটিশ ভারতের বা সামন্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে আছে ও ভারতের অন্য যে সকল অংশ বর্তমানে বৃটিশ ভারত বা সামন্ত রাজ্য উভয়েরই বাহিরে রহিয়াছে এবং তদুপরি, যে সকল এলাকা ভারতের স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইতে ইচ্ছুক এবং

এই এলাকাগুলি তাহাদের বর্তমান সীমানা বা গণ-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অপর কোনও সীমানাসহ, প্রবর্তিত শাসন-তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী, ইউনিয়নের উপর যে সকল ক্ষমতা ও কার্যভার অর্পিত হইবে অথবা স্বভাবতঃই যে সকল ক্ষমতা ও কার্যভার ইউনিয়নের হাতে আসিবে, তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং স্বশাসক এলাকার মর্যাদা অর্জন করিবে এবং এই সার্বভৌম স্বাধীন ভারতে, উহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অংশে শাসনযন্ত্রের সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকার ক্ষমতা

ও কর্তৃত্ব জনসাধারণের নিকট হইতেই লব্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং

এই ইউনিয়নে ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ যাহাতে সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার লাভ করে ; আইনের চোখে সকলে সমতুল্য মর্যাদা ও সুযোগ পায় ; ইউনিয়নের প্রবর্তিত বিধানাবলী এবং সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চিন্তা, ভাষা, বিশ্বাস, ধর্মমত, পূজার্চনা, বৃত্তি, সভা-সমিতি ও কার্যের স্বাধীনতা অর্জন করে তাহার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইবে এবং উহা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা হইবে এবং

এই ইউনিয়নে সংখ্যালঘু, অনগ্রসর ও উপজাতীয় এলাকা-সমূহ এবং অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য পর্যাপ্ত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদ্দ্বারা সাধারণতন্ত্রের এলাকার অখণ্ডতা এবং সভ্য জাতিসমূহের দ্বারা স্বীকৃত ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ও বিধান অনুযায়ী জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে উহার সার্বভৌম অধিকার রক্ষিত হইবে এবং

এই প্রাচীনভূমি যাহাতে বিশ্বসভায় তাহার যথাযোগ্য মর্যাদালাভ করিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

গান*

(১)

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং

শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,

দ্বি-ত্রিংশ কোটি ভুজৈঃ ধৃত খর করবালে,

অবলা কেন মা এত বলে,

বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্র

---

* পতাকা উত্তোলন বা অবতরণকালে যতটুকু গাওয়া হয় মাত্র ততটুকুই উদ্ধৃত হইল।

(২)

জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণ-মঙ্গল-দায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

(৩)

প্রেমিক বিশ্ব তিরঙ্গা প্যারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা ॥
সদা শক্তি বরসানেওয়ালা,
প্রেম সুধা সরসানেওয়ালা,
বীরোঁ কো হরষানেওয়ালা,
মাতৃভূমিকা তনমন সারা ॥
ইস ঝণ্ডেকে নীচে নির্ভয়,
লেঁ স্বরাজ্য য়হ অবিচল নিশ্চয়,
বোলো 'ভারত মাতা কী জয়',
স্বতন্ত্রতা হী ধ্যেয় হমারা

আও প্যারে বীরোঁ আও,
দেশ ধর্ম পর বলি বলি জাও,
এক সাথ সব মিল কর গাও,
প্যারা ভারত দেশ হমারা।
ইসকী শান ন জানে পাওয়ে,
চাহে জান ভলে হী জাওয়ে
বিশ্ব মুক্ত করকে দিখলাওয়ে,
তব হোওয়ে প্রাণ পূর্ণ হমারা।

অজ্ঞাত

(৪)

রাষ্ট্র গগনকী দিব্য জ্যোতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমো নমো।
ভারত জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো॥
করমেঁ লেকর ইসে শূরমা কোটি কোটি ভারত সন্তান,
হঁসতে হঁসতে মাতৃভূমিকে চরণোঁপর হোঙ্গে বলিদান,
হো ঘোষিত নির্ভীক বিশ্বমেঁ তরল তিরঙ্গা নবল নিশান,
বীর হৃদয় খিল উঠে মার লে ভারতীয় ক্ষণমে ময়দান।
হো নস নসমেঁ ব্যাপ্ত চরিত শূরমা শিবিকা নমো নমো।
ভারত জননী কে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো॥
উচ্চ হিমালয় কী চোটীপর জাকর ইসে উড়ায়েঙ্গে;
বিশ্ব বিজয়িনী রাষ্ট্র পতাকা কা গৌরব ফহরায়েঙ্গে।

সমরাঙ্গন মেঁ লাল লাড়লে লাখোঁ বলি বলি জায়েঙ্গে,
সবসে উঁচা রহে ন ইসকো নীচে কভী ঝুকায়েঙ্গে,
গুঞ্জে স্বর সংসার সিন্ধুমেঁ স্বতন্ত্রতাকা নমো নমো।
ভারত জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো ॥

অজ্ঞাত

(৫)

তোমারি পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি ॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ,
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়িয়ে চাহিনা মুকতি।
দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ
সাথে যদি দাও ভকতি ॥

রবীন্দ্রনাথ